বাংলাদেশে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবসের তাৎপর্য

রিমন মাহফুজ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (এফডিসি)' গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ওই দিনটিকে স্মরণ করে ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশে ৩ এপ্রিল দিবসটি জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও 'বিশ্ব চলচ্চিত্র দিবস' বলে কোনো দিবস পালন হয় এমন খবর জানা যায়নি। ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে বিশ্বে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়। বিশ্বের অন্যতম শিল্পমাধ্যম হলেও বিজ্ঞান ও কলানির্ভর গণমাধ্যম চলচ্চিত্র পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের বিনোদন, শিক্ষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের উপকরণ যোগাচ্ছে। তা হলে চলচ্চিত্র দিবস কেন পালিত হচ্ছে না পৃথিবীর অন্য কোথাও? অথচ শিল্পের অন্য অনেক বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন দিবস কিন্তু ঠিকই পালিত হচ্ছে পৃথিবীজুড়ে, যেমন বিশ্ব নৃত্য দিবস, বিশ্ব নাট্য দিবস ইত্যাদি। আর যত ক্ষুদ্র পরিসরেই হোক, বিশেষত শিল্পের অতশত অভিভাবক থাকতে, বাংলাদেশেই পালিত হচ্ছে দিবসটি। বিশ্বে কোথাও চলচ্চিত্র দিবস উদ্‌যাপন না হলেও বাঙালিরাই বিশ্ববাসীকে নেতৃত্ব দিয়েছে।

দেশীয় চলচ্চিত্রের অবক্ষয়ের এ সঙ্কটময় সময়ে যুগস্রষ্টা নির্মাতা, অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ চলচ্চিত্র শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশার কথা ঢাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য বড় শহরেও আজ চলচ্চিত্র শিক্ষার অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র বিভাগ চালু হয়েছে। চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণকারী তরুণদের অনেকে প্রত্যক্ষভাবে চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি সম্প্রতি গড়ে ওঠা অনেক বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে কাজ করছেন। সম্প্রতি সরকারি অর্থায়নে 'চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট' স্থাপন বিল মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। সবচেয়ে খুশির খবর সরকার প্রতি বছর ৩ এপ্রিলকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, খান আতাউর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ফরিদপুরের মোহন মিয়া (লাল মিয়া) প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এদেশে চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালে ৩ এপ্রিল তদানীন্তন প্রাদেশিক পরিষদে বিল উত্থাপন করে 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন' (এফডিসি) প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। আব্দুল জব্বার খান, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, নাজীর আহমদ, আবুল খায়ের প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ঢাকায় ইপিএফডিসি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৭ সালে ৩ এপ্রিল সংসদে পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন বিল পাশ হলে এফডিসিকে কেন্দ্র করে এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের সংগঠিত উদ্যোগ শুরু হয়। তারপর থেকে ঢাকায় চলচ্চিত্র শিল্পের এক শক্ত বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। মুখ ও মুখোশ, আসিয়া, আকাশ আর মাটি, জাগো হুয়া সাভেরা, মাটির পাহাড়, এদেশ তোমার আমার, রাজধানীর বুকে, কখনো আসেনি, সূর্যস্নান, কাঁচের দেয়াল, নদী ও নারী এবং আরও পরে সুতরাং, জীবন থেকে নেওয়া ইত্যাদি কাহিনি নির্ভর বাণিজ্যিক ছবি নির্মাণের মধ্য দিয়ে কিছুটা সংগঠিত হয়ে ওঠে ঢাকার চলচ্চিত্র। কিন্তু একই সময়ে বাণিজ্যিক স্বার্থ আর মেধাহীন অনুকরণপ্রিয়তার কারণে স্থূল চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষয়রোগ ঢাকার চলচ্চিত্রকে পেয়ে বসে।

ঢাকার চলচ্চিত্রে শিক্ষিত তরুণ মধ্যবিত্তের আগমন ঘটে ষাটের দশকের শেষদিকে, যাদের হাতে বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। ষাটের দশকে জহির রায়হান, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কবির চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক, আলমগীর কবির, কলিম শরাফী, মাহবুব জামিল প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিদের দেখা যায় সিনেক্লাব, ফিল্ম সোসাইটি ইত্যাদি সংগঠনের নেতৃত্বদানকারী হিসেবে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে অভিষেক ঘটে যে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের সেই নতুন দেশে নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্র নির্মাতারাই পরবর্তীতে এদেশে বিকাশমান বিকল্প চলচ্চিত্র ধারা গড়ে তোলেন। সামাজিক সম্ভাবনা, মুক্তিযুদ্ধ, প্রগতি, গণমুক্তির বিষয়ে অঙ্গীকার নিয়ে তাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে এসেছেন। বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র কর্মীদের এই আন্দোলন ও প্রচেষ্টার ফলে এদেশে একটি ফিল্ম আর্কাইভ গড়ে উঠেছে। অপরপক্ষে মূলধারা নামে এফডিসি কেন্দ্রিক বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্র এদেশে কিছু হাতেগোনা ব্যতিক্রম ছাড়া ক্রমেই হয়েছে দিশাহারা ও লক্ষ্যচ্যুত। ফলে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট অভূতপূর্ব শিল্পসম্ভাবনা থেকে দেশের মানুষ বঞ্চিত হলো। গণবিনোদনের অপার সম্ভানাময় এ শিল্পখাতটি আজ তাই মৃত্যুপথযাত্রী।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ই শুরু হয়েছিল এক নতুনধারার চলচ্চিত্রের পথ চলা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে নির্মিত হয় 'স্টপ জেনোসাইড'। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস গণহত্যা ও শরণার্থীদের মৃত্যুর প্রতিরোধ স্পৃহার ওপর ভিত্তি করে এ ছবিটি নির্মিত হয়েছে, যা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে গড়ে ওঠে বিশ্ব জনমত। স্বাধীনতার পর নির্মিত হয় একগুচ্ছ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও আমাদের চলচ্চিত্রে জীবনঘনিষ্ঠ সমাজ বাস্তবতা দেখতে চেয়েছিলেন দেশের মানুষ ও বিশ্ববাসী। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর একের পর এক এ দেশে নির্মিত হয়েছে মুনাফা অর্জনকারী ফর্মুলাভিত্তিক নকল চলচ্চিত্র। এসব চলচ্চিত্রে মানুষ সমাজ বাস্তবতার স্পর্শ পায়নি। ষাটের দশকে আমাদের দেশের সোনালি দিনের চলচ্চিত্র যেন নির্বাসিত হয় কালো

অন্ধকারে। অবশ্য আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে একদল তরুণ নির্মাতা সামাজিক বাস্তবতাকে আবারো সেলুলয়েডের ফিতায় তুলে ধরেন। চলচ্চিত্র সংসদের আন্দোলনের পটভূমিতে এ ধারা দেশে নান্দনিক ধারার অনেক চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছে। কিন্তু এ ব্যতিক্রমটুকু ছাড়া দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের অন্ধকার কাটেনি।

ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণ

১৯৫৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত আব্দুল জব্বার খান পরিচালিত মুখ ও মুখোশ বাংলাদেশ (তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) প্রথম স্থানীয়ভাবে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র। ১৯২৭-২৮ সালে ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। নওয়াব পরিবারের কয়েকজন তরুণ সংস্কৃতিসেবী নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র সুকুমারী। এর পরিচালক ছিলেন জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন ক্রীড়াশিক্ষক অম্বুজপ্রসন্ন গুপ্ত। চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা ছিলেন খাজা নসরুল্লাহ ও সৈয়দ আবদুস সোবহান। উল্লেখ্য তখন নারীদের অভিনয়ের রেওয়াজ চালু হয়নি। নাট্যমঞ্চের নারীচরিত্রেও পুরুষেরাই অভিনয় করতেন। নওয়াব পরিবারের উদ্যোগে ঢাকায় ইস্ট বেঙ্গল সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানি গঠিত হয়।

১৯৫৫ সালে নাজীর আহমদের উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম ফিল্ম ল্যাবরেটরি এবং স্টুডিও চালু হয়। তিনি পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার প্রথম নির্বাহী পরিচালক। তার কাহিনি থেকে ফতেহ লোহানী নির্মাণ করেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র আসিয়া (১৯৬০)। নবারুণ (১৯৬০) নামের একটি প্রামাণ্যচিত্র। নতুন দিগন্ত নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন নাজীর আহমদ। ১৯৫৪ সালে গঠিত হয় ইকবাল ফিল্মস এবং কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড। ইকবাল ফিল্মস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মোহাম্মদ মোদাব্বের, মহিউদ্দিন, শহীদুল আলম, আবদুল জব্বার খান, কাজী নুরুজ্জামান প্রমুখ। ড. আবদুস সাদেক, দলিল আহমদ, আজিজুল হক, দুদু মিয়া, কবি জসীমউদ্দীনপ্রমুখ ছিলেন কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেডের সঙ্গে। দলিল আহমেদের পুত্র বুলবুল আহমেদ এবং দুদু মিয়ার পুত্র আলমগীর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে জনপ্রিয় নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।

১৯৫৪ সালে ইকবাল ফিল্মসের ব্যানারে এই ভূখণ্ডের প্রথম চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশ-এর কাজ শুরু করেন আবদুল জব্বার খান। কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্সের ব্যানারে স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের আপ্যায়ন-এর কাজ শুরু করেন সারোয়ার হোসেন। ১৯৫৫ সালে জুন মাসে তেজগাঁওয়ে সরকারি ফিল্ম স্টুডিও চালু হয়। ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট আবদুল জব্বার খান পরিচালিত বাংলাদেশের প্রথম সবাক বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশ মুক্তি পায়। পরিচালক নিজেই নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন। নায়িকা চরিত্রে ছিলেন চট্টগ্রামের পূর্ণিমা সেন।

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান (বঙ্গবন্ধু, পরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি) উত্থাপিত বিলের মাধ্যমে পূর্বপাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ইপিএফডিসি) প্রতিষ্ঠিত হলে এর সহযোগিতায় ১৯৫৯ সালে থেকে প্রতিবছর চলচ্চিত্র মুক্তি পেতে থাকে। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে এদেশে কোনো চলচ্চিত্র মুক্তি পায়নি। এফডিসি ছাড়াও পপুলার স্টুডিও, বারী স্টুডিও এবং বেঙ্গল স্টুডিও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পরিস্ফুটনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এফডিসি প্রতিষ্ঠার পরে চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অনেক যোগ্য ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। ১৯৫৯ সালে ফতেহ লোহানীর আকাশ আর মাটি, মহিউদ্দিনের মাটির পাহাড়, এহতেশামের এদেশ তোমার আমার এই তিনটি বাংলা চলচ্চিত্র ছাড়াও এ.জে. কারদারের জাগো হুয়া সাভেরা উর্দু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের শুরুর দশকে নির্মিত ৫টি চলচ্চিত্র শিল্পমানে উত্তীর্ণ বলেই চলচ্চিত্রবোদ্ধারা মনে করেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী চলচ্চিত্র

স্বাধীনতার পরে আবির্ভূত চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে আলমগীর কবির (১৯৩৮-১৯৮৯) উল্লেখযোগ্য। তার নির্মিত চলচ্চিত্র হলো ধীরে বহে মেঘনা (১৯৭৩), সূর্য কন্যা (১৯৭৬), সীমানা পেরিয়ে (১৯৭৭), রূপালী সৈকতে (১৯৭৯), মোহনা (১৯৮২), পরিণীতা (১৯৮৬) ও মহানায়ক (১৯৮৪)। স্বাধীনতার বছর ১৯৭১ সালে এদেশে ৮টি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। এর মধ্যে নজরুল ইসলামের স্বরলিপি, অশোক ঘোষের নাচের পুতুল, আলমগীর কুমকুমের স্মৃতিটুকু থাক এবং খান আতাউর রহমানের সুখ দুঃখ, সামাজিক চলচ্চিত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭২ সালে আলমগীর কবিরের ধীরে বহে মেঘনা, জহিরুল হকের রংবাজ, সুভাষ দত্তের বলাকা মন, ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশেষ মানে উন্নীত করে। এই সুস্থ ও সৃজনশীল ধারায় ১৯৭৪ সালে নির্মিত হয় নারায়ণ ঘোষ মিতার আলোর মিছিল। ১৯৭৫ সালে নারায়ণ ঘোষ মিতার লাঠিয়াল, খান আতার সুজন সখী এই ধারারই প্রবাহ। ১৯৭৬ সালে ছয়টি চলচ্চিত্র বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ধারণাকেই পাল্টে দেয়। যেমন রাজেন তরফদারের পালঙ্ক, হারুনর রশীদের মেঘের অনেক রঙ, আলমগীর কবিরের সূর্য কন্যা, কবীর আনোয়ারের সুপ্রভাত, আবদুস সামাদের সূর্যগ্রহণ এবং আমজাদ হোসেনের নয়নমনি। ১৯৭৭ সালে আলমগীর কবিরের সীমানা পেরিয়ে, সুভাষ দত্তের বসুন্ধরা পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থতার দাবিদার। ১৯৭৮ সালে আমজাদ হোসেনের গোলাপী এখন ট্রেনে এবং আবদুল্লাহ আল মামুনের সারেং বৌ শিল্পসফল চলচ্চিত্র হিসেবে নন্দিত। স্বাধীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয় ১৯৭৯ সালে। মসিউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলীর যৌথ নির্মাণ সূর্য দীঘল বাড়ি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচয় করিয়ে দেয়। আলমগীর কবিরের রূপালী সৈকতেও এই সময়ের উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র।

১৯৮৪ সালে আখতারুজ্জামানের প্রিন্সেস টিনা খান, কাজী হায়াৎ-এর রাজবাড়ি, কামাল আহমেদের গৃহলক্ষ্মী, সুভাষ দত্তের সকাল সন্ধ্যা, চাষী নজরুল ইসলামের চন্দ্রনাথ, আমজাদ হোসেনের সখিনার যুদ্ধ ও ভাত দে। ১৯৮৫ সালে শক্তি সামন্ত ও সৈয়দ হাসান ইমামের অবিচার, শেখ নিয়ামত আলীর দহন, রাজ্জাকের সৎভাই ও শহিদুল আমিনের রামের সুমতি দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। আশির দশকের শেষার্ধে সুভাষ দত্তের ফুলশয্যা (১৯৮৬), আলমগীর কবিরের পরিণীতা (১৯৮৬), চাষী নজরুল ইসলামের শুভদা, বুলবুল আহমেদের রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত (১৯৮৭), নারায়ণ ঘোষ মিতার হারানো সুর (১৯৮৭), আফতাব খান টুলুর দায়ী কে (১৯৮৭), কবীর আনোয়ারের তোলপাড় (১৯৮৮), মহিউদ্দিন ফারুকের বিরাজবৌ (১৯৮৮) এবং নব্বই দশকের প্রথমার্ধে সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকীর আয়না বিবির পালা (১৯৯১), এহতেশামের চাঁদনী (১৯৯১) প্রভৃতি চলচ্চিত্র আলোচিত হয়েছে। চাষী নজরুল ইসলামের হাসন রাজা, তানভীর মোকাম্মেলের লালন (২০০৪), মোরশেদুল ইসলামের দুখাই, লালসালু, আখতারুজ্জামানের পোকামাকড়ের ঘরবসতি, তারেক মাসুদের মাটির ময়না (২০০২), কাজী মোরশেদের ঘানি (২০০৮) উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

২০০২ সালে তারেক মাসুদ পরিচালিত মাটির ময়না বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিল্ম ফেস্টিভাল 'কান ফিল্ম ফেস্টিভাল' এ ডিরেক্টর'স ফোর্টনাইট ক্যাটাগরিতে মনোনীত ও প্রদর্শিত হয়, যা বাংলাদেশের জন্য একমাত্র অর্জন এই সিনেমাটি দিয়েই। তাছাড়াও ২০০৩ সালে ছবিটি সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে একাডেমি পুরস্কারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। চূড়ান্ত পুরস্কারের জন্য মনোনীত না হলেও এটি বেশ গুরুত্ববহ ছিল। কারণ এটিই প্রথম বাংলাদেশি ছবি যা অস্কারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রেরণ করা হয়। এরপর দুই বছর কোনো বাংলাদেশি ছবি অস্কারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। ২০০৬ সাল থেকে প্রতি বছরই বাংলাদেশ থেকে একটি চলচ্চিত্র অস্কারের জন্য পেশ করা হচ্ছে। ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত পেশ করা সিনেমা তিনটি হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদের শ্যামল ছায়া, আবু সাইয়িদের নিরন্তর এবং গোলাম রাব্বানী বিপ্লবের স্বপ্নডানায়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে পেশ করা হয়েছে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর 'ডুব' চলচ্চিত্রটি। সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমাদৃত ছবির মধ্যে রয়েছে নাসিরুদ্দিন ইউসুফের গেরিলা, মোস্তফা সরোয়ার ফারুকীর টেলিভিশন, অমিত আশরাফের উধাও এবং দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোচিত-সমালোচিত ছবি রুবাইয়াত হোসেনের মেহেরজান।

তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ।